আলী হাসান উসামা বিরচিত

রক্তাক্ত লাল মসজিদ

youtube.com/dailysunnah

উৎসর্গ

হুসাইনি কাফেলার আদর্শবাহী যাত্রী শুহাদায়ে লাল মসজিদের উদ্দেশে আমাদের এই ক্ষুদ্র নজরানা

বিষয়সূচি

রক্তাক্ত লাল মসজিদ এবং আমাদের নির্লিপ্ততা ৪

ইসলামাবাদের সাত শহিদ মসজিদ পুনঃনির্মাণের দাবি ৭

শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রায়োগিক রূপ ৯

ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বার আন্দোলন ১১

আন্দোলনের ব্যাপারে মাওলানা আবদুল আজিজের দৃষ্টিভঙ্গি ১৫

শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ১৮

প্রায়োগিক পদক্ষেপ ও সংশোধনমূলক প্রচেষ্টার সূচনা ২০

শাহাদাতের সুধা ২৩

হুসাইনি কাফেলার যাত্রী আমরা ২৫

হৃদয়ে বাজে বেদনার সানাই ৩০

রক্তাক্ত লাল মসজিদ এবং আমাদের নির্লিপ্ততা

২০০১ সালে যখন আমেরিকা ইসলামি ইমারাহ আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ চালায় এবং পরবর্তীতে যখন ক্রুসেডার সংঘ ন্যাটোও তাদের সঙ্গে মিলে আফগানের ভূমি থেকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূলোৎপাটন করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে তখন এর কিছু প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের ওপরও পড়ে। পাকিস্তান যদিও ইতিপূর্বে আফগানিস্তানকে ইসলামি ইমারাহ হিসেবে মেনে এসেছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, তারা নিজেদের আদর্শ পরিবর্তন করে রাতারাতি আমেরিকা ও ন্যাটোর সহযোগী রাষ্ট্রে পরিণত হলো। তারা আফগান মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদেরকে খোলাখুলি সহযোগিতা দিতে লাগল। এর পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার শক্ত হাতে সমাজ পরিবর্তনেরও ধারাপাত করল। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সরকারের এজেন্ডাগুলো একের পর এক বাস্তবায়িত হতে লাগল। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি একদা ইসলামের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত। কিন্তু কার্যত এ সময়ে এসে চারিদিকে স্রোতের মতো ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা হতে দেখা গেল। আইনের অনেক ধারার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা হলো। সুকৌশলে ইসলামপন্থীদের কোণঠাসা করে রাখা হলো। খোদাদ্রোহ, দীন বিরোধিতা, অশ্লীলতা ও বেহায়পনা এবং পুঁজিবাদি লুণ্ঠন পুরো দেশকে ছেয়ে ফেলল। মিডিয়াকে এতটাই বাকস্বাধীনতা দেওয়া হলো যে, তারা ঠুনকো সব অজুহাতে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে রীতিমতো তাচ্ছিল্য করতে লাগল। এসব কিছু যে সময় সংঘটিত হচ্ছিল তখন পাকিস্তানের দুটো প্রদেশে ইসলামপ্রেমী মানুষদের শাসন কার্যকর ছিল এবং জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলিমের উপস্থিতি ছিল। যার কারণে সাধারণ তাওহিদি জনতার অন্তরে এই প্রশ্ন জাগা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না

যে, জাতীয় সংসদে এত সংখ্যক আলিমের সরব উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও দেশে ইসলাম বাস্তবায়িত হওয়া তো দূরের কথা; তৎকালীন শাসকের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ রোধেও তাদের সবিশেষ উল্লেখ করার মতো কোনো অবদান কেন চোখে পড়ে না।

পরিস্থিতির এই ক্রান্তিকালে ইসলামাবাদে অবস্থিত লাল মসজিদ থেকে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। যে আন্দোলনকে 'তেহরিকে শরিয়ত' নামে নামকরণ করা যেতে পারে। লাল মসজিদের ব্যাপারে এই বাস্তবতা মুসলমানদের অজানা নয় যে, এই মসজিদ সর্বদা দীনি আন্দোলনের মারকাজ হিসেবে ভূমিকা পালন করে এসেছে। 'তেহরিকে নেজামে মুস্তফা', 'তেহরিকে খতমে নবুওয়াত', 'তেহরিকে তাহাফফুজে নামুসে রিসালাত' থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আগ্রাসী আক্রমণের প্রতিবাদ—সব ক্ষেত্রেই এই মসজিদ থেকে তাওহিদের ধ্বনি উচ্চকিত হয়েছে এবং এর মিম্বার থেকে যথাযথ দিকনির্দেশনা পেয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সিপাহিরা নতুন বলে বলিয়ান হয়েছে।

আমেরিকা যখন আফগানিস্তানের ওপর ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তখন হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ শহিদ রহ.-এর জবান আমেরিকার বিরুদ্ধে পুরোদস্তর গর্জে ওঠে এবং শেষাবধি এই অপরাধেই (?) তাকে শহিদ করে দেওয়া হয়। লাল মসজিদ সেই সময় আন্দোলনের রণক্ষেত্রে পরিণত হয় যখন পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাওহিদবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায় এবং যার কারণে মুজাহিদদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লাল মসজিদের খতিব মাওলানা আবদুল আজিজ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তার সেই ঐতিহাসিক ফাতওয়া দেন; পরবর্তীতে যাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে ও আল্লামা আবদুর রশিদ গাজি শহিদ রহ.-এর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। এ সময় লাল মসজিদের অধীনে পরিচালিত মহিলা মাদরাসা জামিয়া হাফসায় পুলিশ দুবার প্রবেশ করে নেহাত পর্দানশীন ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং অনেক ছাত্রীকে আহত করে। এই আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য স্বার্থে ইসলামাবাদে সাত সাতটি মসজিদ শহিদ করে দেওয়া হয়, আরও ১০টি মসজিদকে নোটিশ দেওয়া হয় এবং এছাড়াও অতিরিক্ত ৮০টি মসজিদ ও মাদরাসাকে ধ্বংসের তালিকায় রাখা হয়। সাত সাতটি মসজিদের শাহাদাত কোনো

মামুলি ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারটি নিয়ে ইসলামপন্থীদের মধ্যে তেমন ভারী কোনো উদ্বেগ বা কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ইসলামাবাদে নামকাওয়াস্তে কিছু প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছে; তবে তা-ও খুব অল্প সময়েই ঝিমিয়ে পড়েছে। এই সঙ্গিন পরিস্থিতিতে উম্মাহর দরদী মনীষী দুভাই, হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ শহিদ রহ.-এর জানেশিন দুই যোগ্য সাহেবজাদা শরিয়াহ বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। মাওলানা আবদুল আজিজ রহ. সে সময় তার এক রচনায় লেখেন—

'এই দেশ ইসলামের জন্য গঠিত হয়েছে। যদি এখানে ইসলামের বাস্তবায়ন হতো তাহলে আমাদের সামনে এত সমস্যা সৃষ্টি হতো না। ছয় লাখের চাইতে অধিক মুসলমান আত্যোৎসর্গ করেছে। মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়েছে, জায়গাজমি ত্যাগ করেছে, কোটি কোটি মানুষ নিগৃহীত হয়েছে। এত সব ত্যাগের ফলাফল তো এটাই হওয়া উচিত ছিল যে, এখানে ইসলাম বাস্তবায়িত থাকবে। কিন্তু এটা আর হয়ে ওঠেনি। ইসলামি শাসনব্যবস্থা এবং ইসলামি দণ্ডবিধি কার্যকর না থাকার কারণে পুরো দেশে চুরি, ডাকাতি, খুন এবং অসংখ্য সামাজিক অপরাধের বীভৎস সব দৃশ্য সামনে আসছে। উৎকোচের অত্যাচার অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ পাচ্ছে না ন্যায্য অধিকার। দারিদ্র্য ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। এসকল সমস্যার সমাধানের সম্ভাবিত পন্থা হলো, যেই প্রতিপালক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রতিপালকের শরিয়াহব্যবস্থাই এখানে বাস্তবায়ন করা হবে।'[১]

[১] *ইসলামি নেজাম কে আমালি নাফায কে লিয়ে ইবতিদায়ি খাকা*। প্রকাশনী : তেহরিকে তালাবা ও তালিবাত।

ইসলামাবাদের সাত শহিদ মসজিদ পুনঃনির্মাণের দাবি

ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবিনির্ভর আলোচনা মাওলানা আবদুল আজিজ দীর্ঘকাল ধরেই করে আসছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন তখন দ্রোহের তপ্ত লাভার মতো বিস্ফোরিত হয় যখন ইসলামাবাদে একের পর এক সাতটি মসজিদ শহিদ করে দেওয়া হয়। সর্বশেষ ২০ জানুয়ারি মুড়ি রোডে অবস্থিত মসজিদে আমির হামজাকে এই কথা বলে শহিদ করে দেওয়া হয় যে, রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে তা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। সে সময় জামিয়া হাফসার ছাত্রীরা সর্বসাধারণ মুসলমানদের থেকে সবিশেষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন দেখতে না পেয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদস্বরূপ লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসার মাঝে অবস্থিত সরকারি লাইব্রেরি জোরপূর্বক দখলে নিয়ে নেয়। এই দখলকে কেন্দ্র করে ইসলামাবাদে বেশ উচ্চবাচ্য শুরু হয়। অবশেষে যখন ইসলামাবাদের সহকারী কমিশনার ফেরাসাত আলি জামিয়া হাফসায় গোলটেবিল বৈঠক করার জন্য আসে তখন ছাত্রীরা পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করে—

- পাকিস্তান সরকার মসজিদে আমির হামজাসহ বিগত কয়েক বছরে শহিদ করে দেওয়া সবগুলো মসজিদ অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পুনঃনির্মাণ করে দেবে। বাকি ১০টি মসজিদের ধ্বংসের নোটিশ ফিরিয়ে নেবে। এছাড়াও অতিরিক্ত আরও ৮০টি মসজিদের যে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে, তা-ও স্থগিত করা হবে। সর্বোপরি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এই মারাত্মক অপরাধের কারণে আল্লাহর কাছে এবং পুরো দেশবাসীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবে।

- নারী অধিকারের প্রস্তাবিত বিলে অন্তর্ভুক্ত সকল শরিয়াহবিরোধী ধারা-উপধারা পুরোপুরিভাবে মিটিয়ে ফেলা হবে।
- জিহাদের মতো পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি বিধানের ব্যাপারে সরকারের ছত্রছায়ায় যত ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তা সব বন্ধ করা হবে।
- পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই অনতিবিলম্বে দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা জারি করা হবে এবং সবক্ষেত্রে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করা হবে।

এই দাবিগুলো বেশিদিন দাবি হিসেবে থাকেনি; বরং সময়ের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রায়োগিক রূপ

মাওলানা আবদুল আজিজ লাল মসজিদের মিম্বার থেকে সকল ভয় ও বাধা উপেক্ষা করে দীর্ঘকাল যাবৎ তাগুতি শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে এবং শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আওয়াজ উচ্চকিত করে এসেছেন। তিনি তার আন্দোলনকে কেবল শহিদ মসজিদ পুনঃনির্মাণের দাবিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সেটাকে সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে নিজের সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করেছেন। মাওলানা আবদুল আজিজ ইসলাম প্রতিষ্ঠার একটি প্রায়োগিক রূপও জাতির সামনে তুলে ধরেছেন; যার গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নিম্নরূপ :

- **ইসলাম প্রতিষ্ঠা** : সারাদেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হবে।
- **শরয়ি আইনকানুন** : সকল আদালতে শরয়ি আইনকানুন কার্যকর করা হবে। বিচারকদের স্ব স্ব পদে আসীন রেখে নতুন করে 'বিচার কোর্স' করানো হবে এবং তাদের সাথে ভালো মুফতিদের নিয়োগ দেওয়া হবে।
- **জুলুমের কর প্রত্যাহার** : আমাদের দেশে বিভিন্ন রকম কর প্রদানের জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করা হয়। অনতিবিলম্বে এসকল কর প্রত্যাহার করা আবশ্যক। সরকার যদি ভাবে যে, কর কমিয়ে আনার কারণে তারা আর্থিক লোকসানের শিকার হবে তাহলে শাসকমণ্ডলির কর্তব্য হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনধারাকে আরও সাদামাটা বানিয়ে আনা এবং অনাবশ্যক ব্যয় ও অপ্রয়োজনীয় খরচের খাতগুলো বন্ধ করে দেওয়া।

- **ইসলামি দণ্ডবিধি কার্যকর করা** : দেশে চুরি, ডাকাতি, খুন এবং লুণ্ঠনের ঘটনা সর্বোচ্চ মাত্রা ছুঁয়েছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধ করার জন্য অনতিবিলম্বে শরয়ি দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে।
- **সুদ দূরীকরণ** : আমাদের দেশের শরয়ি আদালত ইতিমধ্যে এ রায় দিয়েছে যে, দেশ থেকে সুদি ব্যবস্থা দূর করতে হবে। এই রায়কে কার্যত মেনে নিয়ে দেশের সবগুলো ব্যাংক থেকে অনতিবিলম্বে সুদের নামগন্ধও মুছে ফেলা হবে।

এছাড়াও তাতে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম সংযুক্ত ছিল। যেমন, মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ, গৃহহীন মানুষদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা, সাংবাদিকদের জন্য শরিয়াহ নির্দেশিত নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন, কারাবন্দিদের ব্যাপারে প্রস্তাব, অনৈসলামিক কার্যকলাপ রোধ, শিক্ষা উন্নয়ন, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সংশোধন, সুন্নাহর পুনর্জীবন বিভাগ প্রতিষ্ঠা, ফিকহি বোর্ড প্রতিষ্ঠা, প্রধান সড়কগুলোর পাশে সাধারণ বিশ্রামাগার নির্মাণ, মাইকের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, জামাতের সঙ্গে নামাজের বাধ্যবাধকতা এবং স্টুডেন্ট সিকিউরিটি ফোর্স প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বার আন্দোলন

লাল মসজিদ থেকে সূচিত হওয়া এই আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাওলানা আবদুল আজিজ, আল্লামা গাজি আবদুর রশিদ রহ.-সহ আন্দোলনের শুরা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকা বিদগ্ধ আলিমগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে মিলে অসাধারণ কিছু উদ্যোগ নেয় এবং উল্লেখযোগ্য আদর্শিক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপগুলো জনসাধারণকে মসজিদ ও মাদরাসার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রেও নিদারুণ ভূমিকা রাখে। এ ব্যাপারে লাল মসজিদের ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের রচনাবলি এবং অন্যান্য নথিপত্র সামনে রাখলে পুরো আন্দোলনের যে বিস্তারিত রূপরেখা সামনে আসে, তা নিম্নরূপ—

- লাল মসজিদ আন্দোলনের একটা নিয়মতান্ত্রিক শুরা কমিটি ছিল; যাতে বিদগ্ধ আলিম ও বিজ্ঞ মুফতিরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের সত্যয়ন পাওয়ার পরই তা কার্যে পরিণত করা হতো।
- লাল মসজিদের অভ্যন্তরে একটি ফাতওয়া বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেকোনো শরয়ি সমস্যার সমাধান ও জিজ্ঞাসার জবাব সেখান থেকে দেওয়া হতো।
- মানুষজনকে দীনি মাসায়িল শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ ছিল।
- সেখানে আলাদা বিচারবিভাগও ছিল। যেখান থেকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মানুষের বিবাদ ও মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা করা হতো।
- আল-কাসিম ফাউন্ডেশন নামে একটি সামাজিক জনকল্যাণমূলক সংস্থা ছিল। যারা দুস্থ, গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য কাজ করত। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত

এলাকাগুলোতে তারা কয়েক কোটি রুপি ব্যয় করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

- প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম প্রকাশ এ-ও ছিল যে, ইসলামের বিপ্লবী সৈনিকদেরকে নিভৃতে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উঠিয়ে আনা হতো। এরপর তাদেরকে পুরোপুরি গুম করে ফেলা হতো। তাদের ওপর নারকীয় তাণ্ডবলীলা চালানোর জন্য কিছু জিন্দানখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। সেগুলোতে রেখে তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হতো। বাইরের পৃথিবী ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত না, এ মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে এবং কোন অবস্থায় তাদের একেকটা দিন কাটছে। তারা কি আদৌ জীবিত আছে নাকি মরে গেছে। এ ধরনের নিখোঁজ মানুষের সন্ধান বের করার জন্য লাল মসজিদের পক্ষ থেকে ডিফেন্স কাউন্সেল অব হিউম্যান রাইটস নামক একটি সুবিন্যস্ত সংগঠনের গোড়াপত্তন করা হয় এবং তাদের আইনি সহযোগিতা প্রদানের জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সংগঠনের প্রচেষ্টায় অসংখ্য নিখোঁজ মুজাহিদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তারা নিরাপদে নিজেদের ঘরে ফিরে আসে।
- ইসলামি বিপ্লবের পথ সুগম করার জন্য তারা বইপত্র প্রকাশ করত।
- বিপ্লবীদের অধীনে স্বতন্ত্র ওয়েবসাইটও বানানো হয়েছিল।
- এফ এম রেডিও'র যাত্রাও শুরু করা হয়েছিল; যার দ্বারা আন্দোলন-সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার করা হতো।

এ সবগুলো বিষয়ই এমন ছিল, যা মুসলিম জনসাধারণকে মসজিদ ও মাদরাসামুখী করতে ভালোরকম ভূমিকা রেখেছে। এর পাশাপাশি মাওলানা আবদুল আজিজ ছাত্র আন্দোলনের প্রায়োগিক রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন। এই রূপরেখার ব্যাপারে কারও শাখাগত মতভিন্নতা থাকতে পারে, তবে এ কথা নির্দ্বিধ স্বীকার্য যে, সকল দীনি প্রচেষ্টা ও আন্দোলনকারীদের জন্য এতে রয়েছে উত্তম দিকনির্দেশনা। তার কতক ধারা ছিল নিম্নরূপ—

- প্রত্যেক এলাকার ছাত্রদের কর্তব্য হলো পরস্পর মিলে এক সুবিন্যস্ত গ্রুপ হওয়া এবং মান্যবর আলিমগণের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা; যারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে।
- ছাত্ররা একটি বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করবে এবং মুসলিম জনসাধারণকে আহ্বান করবে, তারা যেন দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি ঘরে রেখে দেওয়ার পরিবর্তে বাইতুল মানে এনে একত্রিত করে; যাতে করে উপযুক্ত ব্যক্তিরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে।
- প্রত্যেক থানায় স্বতন্ত্র মীমাংসালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেই মীমাংসালয়ে বিদগ্ধ আলিমগণ এবং এলাকার গণ্যমান্য মুরুব্বিরা উপস্থিত থাকবে। মীমাংসালয় প্রতিষ্ঠা করার পর সাধারণ জনগণকে আহ্বান করা হবে, তারা যেন নিজেদের মোকাদ্দমা নিয়ে থানায় যাওয়ার পরিবর্তে এবং নিজেদের মোকাদ্দমা অনৈসলামিক পন্থায় সমাধা করার পরিবর্তে সেখানে এসে শরিয়াহর আলোকে সমাধা করে নেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করে।
- প্রত্যেক থানার অধীনে একটি করে অভিযোগ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এরপর মানুষজনকে অবগত করে দেওয়া হবে যে, যদি থানাবাসীদের ওপর তাদের কোনো অভিযোগ থাকে কিংবা অন্য কেউ যদি তাদের ওপর কোনো অত্যাচার করে তাহলে এই অভিযোগ কেন্দ্রে এসে তারা যেন নিজেদের অভিযোগ দায়ের করে; যাতে করে তা দূর করার জন্য সাধ্যমতো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়।
- ছাত্ররা নিজেদের রুটিন বানিয়ে নেবে, প্রত্যেক ছুটির সময় তারা ৩০ বা ৪০ জনের একেকটা জামাআত বানাবে। জামাআতের সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনে এরচে কম বা বেশিও হতে পারে। তাদের কাজ হবে, তারা দলবদ্ধভাবে গিয়ে মহাসড়কের পাশে দাঁড়াবে। এরপর তারা উপযুক্ত পন্থায় সেখান থেকে অতিক্রমকারী গাড়ি থামিয়ে চেক করবে, সেগুলোতে টেপ বা ভিসিআরে অশ্লীল গানবাজনা চালানো হচ্ছে কি না। একান্ত যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে ড্রাইভারকে এর জন্য প্রয়োজনমাফিক শায়েস্তা করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ সতর্ক করে দেবে।

- ছাত্ররা নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত ভিডিও ও সিডির দোকান এবং হোটেলগুলোতে ৩০-৪০ জন করে জামাআত বানিয়ে যাবে। এরপর সেসব দোকানদার ও হোটেল মালিককে বোঝাবে, এসব কারবারের কারণে পুরো সমাজে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে। যুবসমাজের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। তারা নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকি লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নিজেদেরই মুসলিম মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করছে। এই অবস্থার দায় মৌলিকভাবে এসব দোকানদারদের কাঁধেই বর্তায়, যারা জাতির হাতে হাতে এসব ঘৃণিত উপকরণ পৌঁছে দিচ্ছে। এসকল দোকানদার ও হোটেল মালিকের কাছে আবেদন জানাবে, তারা যেন জলদি করে এসব কারবার সমাপ্ত করে এবং এর বিকল্প সন্ধান করে।
- সমাজের বিনির্মাণ ও অবক্ষয়ে সাংবাদিকদের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এ জন্য সাংবাদিক ভাইদের শরয়ি দিকনির্দেশনার আলোকে আমল করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা আবশ্যক।
- ছাত্ররা যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে নিজ নিজ এলাকায় দলবদ্ধ হয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ও হাতে লাঠি নিয়ে যেন ঘোরাফেরা করে; যাতে করে এর প্রভাবে এলাকায় চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়ে যায়।
- সমস্ত আলিম ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান, যদি তাদের এলাকায় আগে থেকেই শরয়ি বিচারক নির্ধারিত থাকে তাহলে তাদের করণীয় হলো, শরিয়াহ ছাড়া সর্বপ্রকার আইনকানুন মিটিয়ে ফেলার জন্য এবং ইসলামি শরিয়াহর বিধিবিধান বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করা।

আন্দোলনের ব্যাপারে মাওলানা আবদুল আজিজের দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা আবদুল আজিজ কেন এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন? মিছিল-মিটিং ও সমাবেশ-মানববন্ধনের প্রচলিত সীমাবদ্ধ পরিসর ডিঙিয়ে অগ্রসরমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে কোন জিনিস তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল? আন্দোলনের সূচনালগ্নে একদিন জুমআর আলোচনায় তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

‘আজ আমাদেরকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ভয়াবহতার কারণ হলো, আমাদের দেশ ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার প্রতিষ্ঠার জন্য ছয় লাখ মুসলমান নিজেদের বুকের তপ্ত খুন উৎসর্গ করেছিল, লাখো মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানি হয়েছিল—কেবলই এই প্রত্যাশায় যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ দীর্ঘ ৬০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অদ্যাবধি এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দিনকেদিন সমস্যা শুধু বেড়েই চলছে। নিত্যনতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এসকল সমস্যা সমাধানের জন্য কনফারেন্স এবং রেজুলেশনের পন্থাই বেছে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ধারণাই লালন করা হয়েছে যে, এ সকল সমস্যার সমাধান এসব রেজুলেশনের মাধ্যমেই সম্ভাবিত হবে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ এ বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে সকলের সামনে প্রতিভাত হয়েছে যে, এসব কনাফারেন্স সমস্যার সমাধানে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারবে না এবং এসব রেজুলেশনেরও কোনো কার্যকারিতা নেই। এসকল প্রচেষ্টা অবশ্যই আপন জায়গায় সঠিক এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সুদৃঢ় প্রত্যাশা এই যে, তিনি এর বিনিময়ে যথাযোগ্য প্রতিদান দান করবেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এসকল

পদক্ষেপের দ্বারা সরকারের ওপর উল্লেখ করার মতো কোনো প্রভাব পড়েনি। যে সকল আলিম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত পৌঁছেছেন, তারা সেখানে নিজেদের আওয়াজ উচ্চকিত করেছেন। কিন্তু তারও কোনো প্রভাব সৃষ্টি হয়নি; বরং প্রতিদিন নিত্যনতুন সমস্যার দুয়ারই শুধু খুলেছে।'[২]

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে উপস্থিত আলিম-উলামা এবং ছাত্রদের সম্বোধন করে মাওলানা আবদুল আজিজ বলেন—

'আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার দাবি আমরা আজ করিনি; বরং বিগত বছরের পর বছর ধরে এই দাবি জারি রয়েছে। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রহ.-এর শাহাদাতের প্রেক্ষিতেও সেই দিন আমি এই আওয়াজ তুলেছিলাম যে, আমি কোনো একক ব্যক্তিকে আব্বাজানের ঘাতক মনে করি না। বরং প্রকৃত ঘাতক তো সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা, আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় যা এখানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ জন্য যদি আমার লড়াই হয় তবে সেই শাসনব্যবস্থার সঙ্গেই আমার লড়াই হবে। আজ যে সকল সুহৃদ এই অভিযোগ আরোপ করছে যে, আমরা এজেন্সিগুলোর রিমোর্টে পরিচালিত হচ্ছি তারা আমার পূর্বের বক্তৃতাগুলো শুনে নিন। এসব বক্তৃতাই সাক্ষ্য দেবে যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে আমি সে সময় থেকেই কথা বলে আসছি। আফগানিস্তানের ওপর যখন হামলা হলো তখনো আমি এ কথাগুলোই বলেছি। ইরাকের ওপর যখন আক্রমণ করা হলো তখনো আমি সুউচ্চ কণ্ঠে একই আওয়াজ বুলন্দ করেছি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন ওয়াজিরিস্তানে হামলা করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল এবং তালেবান, আল-কায়দাসহ অন্য সব মুজাহিদরা বিরাট ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তখনো আমি একই কথা বলে এসেছি।'

এসকল বক্তব্য পড়লে এবং মাওলানার পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের জন্য প্রণীত রূপরেখা সামনে রাখলে এ ফলাফলে পৌঁছাতে কোনো বেগ পেতে হয় না যে, তিনি আমাদের ওপর জোরপূর্বক আপতিত কুফরি শাসনব্যবস্থার কেবল শাখাগত সংশোধনের আহ্বায়ক ছিলেন না; বরং তিনি প্রচলিত এই ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করার পক্ষপাতী ছিলেন। মাওলানার এই অবস্থানকে অনেক উল্লেখযোগ্য আলিমও সমর্থন

[২] কিতাবচা তেহরিকে তালাবা ওয়া তালিবাত

করেছেন এবং তারা তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকারও দিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বইপত্রে তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণকারী যে সকল আলিমের নাম উল্লেখিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মুনাজিরে আজম মাওলানা সরফরাজ খান সফদর, শাইখুল মাশায়িখ মাওলানা সায়্যিদ মাহমুদ চন্দলবাবাজি, মাওলানা ডা. শের আলি শাহ, শাইখুল হাদিস মাওলানা নুরুল হুদা করাচি, হজরত মাওলানা আবদুল করিম কলাচওয়ি, মাওলানা পির আবদুর রহিম নকশবন্দি, মাওলানা আবদুল কাইয়ুম হক্কানি, মাওলানা সাইফুল্লাহ হক্কানি, শাইখুল হাদিস মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ ফরিদসহ আরও অনেক বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ বিদগ্ধ আলিমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসকল আল্লাহওয়ালা হক্কানি আলিমগণের কীর্তি হলো, তারা জিহাদি আন্দোলনগুলোকে নিজেদের নিন্দা ও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাননি; বরং উল্টো সেগুলোর তত্ত্বাবধান করে মুজাহিদদের সাহস সঞ্চার করেছেন এবং আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য সর্বদা দুয়া অব্যাহত রেখেছেন।

শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

১০ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৩০ মার্চ লাল মসজিদে জুমআর নামাজের পূর্বে মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব তার আলোচনায় সরকারকে এক সপ্তাহের সুযোগ দিয়ে বলেন—

'আপনারা এই এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন। অন্যথায় আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা কনফারেন্সে আমরা নিজেরাই শরয়ি আইনকানুন বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে দেবো।'

সে দিন মাওলানা ডা. শের আলি শাহ সাহেবও লাল মসজিদে বক্তৃতা করেছিলেন এবং তিনি তার বক্তৃতায় মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। এরপর পরবর্তী জুমআর দিন, অর্থাৎ ১৭ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৬ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে লাল মসজিদে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী বলেন—

'আজ থেকে লাল মসজিদ, জামিয়া হাফসা এবং দখলকৃত লাইব্রেরির অভ্যন্তরে শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আর আল্লাহ চাইলে আগামী দিনগুলোতে এর পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।'

তিনি আরও বলেন—

'জমিন আল্লাহর। এ জন্য এর ওপর একমাত্র আল্লাহর আইনই চলবে। যেসব লোক এখানে আল্লাহর আইনের খেলাফ শাসন প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, তারা আল্লাহর

রাজত্বের মধ্যে নিজেদের বাতিল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। আমরা ঘোষণা করছি, আল্লাহর জমিনে একমাত্র আল্লাহর শাসনই চলবে এবং তাঁরই রাজত্ব থাকবে।'

এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আলিম-উলামাকে সম্বোধন করে আবেদন জানান—

'আপনারা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনে সঙ্গ দিন এবং নবীনদের তত্ত্বাবধান করার নিমিত্তে অগ্রসর হোন।'[৩]

[৩] কিতাবচা তেহরিকে তালাবা ওয়া তালিবাত

প্রায়োগিক পদক্ষেপ ও সংশোধনমূলক প্রচেষ্টার সূচনা

- ইসলামাবাদে যখন মসজিদে আমির হামজাকে শহিদ করা হয় তখন তা ছিল তাগুতি সরকারের হাতে ধ্বংস হওয়া সপ্তম মসজিদ। এ নিয়ে তাওহিদি জনতা ও আলিম-উলামার আন্দোলনকে সরকার দু-পয়সারও মূল্য দেয়নি। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামপ্রিয় এলাকাবাসী, বিশেষ করে জামিয়া হাফসার ছাত্রীরা চরম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রতিশোধস্বরূপ তারা ২১ জানুয়ারি সকালে জামিয়া হাফসা ও লাল মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত গভর্নমেন্ট চিলড্রেন লাইব্রেরি দখলে নিয়ে নেয়। এভাবে তারা সরকারকে এই বার্তা দেয় যে, তারা যেন অমানবিক পন্থায় মসজিদ ধ্বংস করা থেকে নিবৃত্ত হয়।
- রবিউল আউয়ালের শুরুতে লাল মসজিদের ছাত্ররা ইসলামাবাদের বিভিন্ন মার্কেটে গিয়ে দাওয়াতি গাশত করে। তারা ভিডিও ক্যাসেট ও সিডির দোকানে গিয়ে দোকানদারদেরকে বোঝায়, মুসলিম সমাজের চারিত্রিক অধঃপতনের অন্যতম উৎস এসব কারবার যেন তারা বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়াও তারা বিভিন্ন সেলুনে গিয়ে নরসুন্দরদেরও বুঝিয়ে আসে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে দাড়ি ছাটা ও মুণ্ডন করার মতো শরিয়াহ-নিষিদ্ধ কার্যাবলি পরিহার করে।
- ভিডিও ক্যাসেট ও সিডি বিক্রেতা কিছু দোকানদার মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনে সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এর পাশাপাশি তারা দাবি জানায়, এই অঞ্চলে অবস্থিত পতিতালয়গুলোকেও যেন বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অন্যথায় যতদিন সেগুলো খোলা থাকবে, মুসলিম যুবা-প্রৌঢ়দেরকে চরিত্রহীন করার পেছনে ব্যাপক অবদান

রাখবে এবং সমাজে অশ্লীলতা ছড়াবে। তারা ইসলামাবাদে অবস্থিত অনেক পতিতালয়ের ঠিকানা ও পরিচয় সেখানে তুলে ধরে। লাল মসজিদের নিকটে আন্টি শামিম নামক একজন পতিতা নারী বিগত ১০ বছর যাবৎ দেহব্যবসার কাজ করে আসছিল। জামিয়া হাফসার ছাত্রীরা আন্টি শামিমের কাছে গিয়ে তাকে উদাত্ত আহ্বান জানায়, সে যেন এসব জঘন্য কাজকর্ম ছেড়ে সুপথে ফিরে আসে। কিন্তু তাদের মার্জিত আহ্বানের জবাবে সেই পতিতা নারী অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তাদেরকে অপমান করে সেখান থেকে বের করে দেয়। ছাত্রীরা বাধ্য হয়ে সে সময় মাদরাসায় ফিরে আসে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন জানা যায়, সেই নারী এলাকাবাসীকে ভীষণরকম জ্বালাচ্ছে তখন পরবর্তী দিন ২৭ মার্চ ২০০৭ তারিখে ছাত্রীরা পুনরায় তার ঘরে গিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং তাকে এই কুকর্ম অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করার জন্য আদেশ করে। এবার সেই দেহপসারিণী নারী শুধু গালিগালাজেই সীমাবদ্ধ থাকল না; বরং ছাত্রীদের ওপর ছুড়ি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ক্রমাগত আঘাতে একজন ছাত্রী মারাত্মক আহত হলো। বাধ্য হয়ে অন্যান্য ছাত্রীরা আন্টি শামিমকে গ্রেফতার করে জামিয়া হাফসায় নিয়ে আসল।

- এটক শহরে ৮ বছরের এক শিশুকে কিছু লোক অপহরণ করে নিয়ে জিম্মি করে রেখেছিল। শিশুর বাবা লাল মসজিদের শরয়ি আদালতে তার সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য বিচারপ্রার্থী হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকের ফায়সালাক্রমে পাঁচজন ছাত্রের একটি ক্ষুদ্র দল গিয়ে অপহরণকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শিশুটিকে ছুটিয়ে আনে। এরপর সেই শিশুকে জামিয়া হাফসায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- চাইনিজ ম্যাসাজ সেন্টারের ঘটনা সুবিদিত। এ ঘটনার পরই তাগুত সরকারের বাহিনী জামিয়া হাফসার ওপর অপারেশন চালায়। ইসলামাবাদে চাইনিজদের একটা ম্যাসাজ সেন্টার ছিল। যেখানে চাইনিজ নারীরা পুরুষদের দেহ মর্দন করে দিত। লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ যখন এই অশ্লীলতার কেন্দ্রের ব্যাপারে অবগত হলো তখন সেটা বন্ধ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের একটা টিম গঠন করা হলো। তারা গিয়ে সেই ম্যাসাজ সেন্টার বন্ধ করে দিলো এবং সেখানে কর্মরত নারীদের চারিত্রিক সংশোধনের জন্য জামিয়া হাফসায় নিয়ে আসল।

সেখানে কিছু যুবকও তাদের হাতে বন্দি হয়েছিল; যাদের মধ্যে গাজি আবদুর রশিদ শহিদ রহ.-এর বক্তব্যমতে জনৈক জাতীয় সংসদ সদস্যের একজন ভাতিজাও ছিল।

শাহাদাতের সুধা

সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ হতে নিষেধ, সামাজিক অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, অশ্লীল সেন্টার বন্ধে কার্যক্রম, জিহাদ ও শাহাদাতের ধ্বনি, পৃথিবীব্যাপী জিহাদি আন্দোলনগুলোর সাহায্য-সহযোগিতা, নারী অধিকার বিলের শরয়ি ধারা-উপধারার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দূর করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ, ইসলামি আদালত প্রতিষ্ঠা ও শরয়ি দণ্ডবিধি প্রয়োগের সচেষ্ট উদ্যোগ—এ সবগুলো বিষয়ই ছিল এমন, যা কুফরি আকিদাধারী তাগুতি শাসকদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের কুফরি পরাশক্তির এজেন্ট সরকারগোষ্ঠী হক ও হক্কানিয়্যাতের আওয়াজ চিরতরে দমিয়ে ফেলার জন্য লাল মসজিদের ওপর খুনি অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসার ওপর কারবালা ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় এবং সেখানকার তাওহিদবাদী বিপ্লবীরা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে হুসাইনি কাফেলায় নিজেদেরকে শামিল করে নেয়। আল্লাহ বলেন—

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

‘মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ (শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূরণ

করেছে, আবার কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি।'[৪]

শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা, মসজিদ আবাদ এবং কুফরি শাসনব্যবস্থা উৎখাত করার প্রচেষ্টায় কোনো স্বার্থের সামনে নিজেদের আদর্শ না বিকিয়ে, বাতিলের সঙ্গে কোনোপ্রকার আপস না করে তারা পরবর্তীদের জন্য এক অনন্যসাধারণ আদর্শ রেখে গেছেন; যুগ-যুগান্তেও যা হয়ে থাকবে অমর। কিয়ামত পর্যন্ত বিপ্লবী তাওহিদবাদীরা যেখান থেকে সংগ্রহ করবে হিদায়াতের আলো।

[৪] সুরা আহযাব : ২৩

হুসাইনি কাফেলার যাত্রী আমরা

শাইখ গাজি আবদুর রশিদ শহিদ রহ. তার শাহাদাতের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একটি ওসিয়তনামা লিখে রেখে গিয়েছিলেন। যাতে তিনি তাগুতের মিডিয়ায় প্রচারিত প্রোপাগান্ডার খণ্ডন করেছেন। মুরতাদ পারভেজ বাহিনীর জঘন্য কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে শাইখ রহ.-এর এই সর্বশেষ বার্তায় মুমিনদের জন্য উত্তম নির্দেশনা রয়েছে। আরও রয়েছে সাহস ও সাহসিকতার পর্যাপ্ত উপকরণ। তিনি তার সেই ওসিয়তনামায় লেখেন—

‘সম্ভাবনা আছে, এই ছত্রগুলো প্রকাশিত হওয়ার আগেই আমরা যারা লাল মসজিদে অবরুদ্ধ আছি, তারা শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করব। প্রায় ৩০ হাজার সদস্যের সিকিউরিটি ফোর্স এবং দেশীয় সেনাবাহিনী ট্যাংক ও সাজোয়াযানের গোলায় ক্ষতবিক্ষত এবং নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের অশ্রুতে সিক্ত লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসা বিজয় করে নিয়েছে। লাল মসজিদে এখন কারবালার দৃশ্য পরিদৃষ্ট হচ্ছে। শহিদদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশ, আহতদের গগনবিদারী আর্তচিৎকার, মসজিদ, মিনার এবং চতুর্দিকের দেয়ালগুলো যেন নিজেদের ভাষায় বলছে, ছয় লাখ মুসলমান যে উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করেছিল, এসব কিছু সেই আওয়াজ পুনরাবৃত্তি করার ফল। এই পরিস্থিতিতে লাল মসজিদের খতিব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবের অপ্রত্যাশিত গ্রেফতারি এবং এরপর টেলিভিশনে প্রকাশিত তার একটি ইন্টারভিউ নিঃসন্দেহে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা লালনকারী জনসাধারণের নৈরাশ্যের কারণ হয়েছে। সাধারণ মানুষ—যারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়—তারা ধারণা করেছে এবং মিডিয়াও বাস্তবতা না জেনে এই সংবাদ প্রচার করতে ব্যস্ত হয়ে গেছে যে, মাওলানা আবদুল আজিজ মৃত্যুভয়ে পলায়নের রাস্তা

বেছে নিয়েছে এবং নিজের সঙ্গী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিঃসঙ্গ ছেড়ে একাকী বেরিয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞ নয়, তারা এটা ভাবে না যে, বাস্তবেই যদি মাওলানা আবদুল আজিজ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে জীবনের দিকে পলায়ন করে থাকে তাহলে নিজের ছেলে, মেয়ে, মা ও স্ত্রীকে কেন রেখে গেল। তা ছাড়া বিষয়টি তেমনই হয়ে থাকলে আমি তার ছোট ভাই, তার অন্যান্য সাথিবর্গ এবং অবশিষ্টব থাকা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরাই বা আত্মসমর্পণের পথ কেন বেছে নিচ্ছে না? আমি অনুধাবন করছি, এই সময়ে বিরুদ্ধবাদী লোকদের বোঝানোর চেষ্টা না করে নিজেদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের ভগ্নহৃদয়ের উদ্দেশে এই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া জরুরি যে, মাওলানা আবদুল আজিজ গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। যদিও এখন তার গ্রেফতারির ওপর গোপনীয়তার পুরু পর্দা পড়ে রয়েছে, কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই পর্দা উঠে যাবে এবং বাস্তবতা সকলের সামনে প্রতিভাত হবে।

আমরা এ কথা খুব ভালো করেই জানি যে, মাওলানা আবদুল আজিজ জিহাদের পথের একজন মুসাফির এবং শাহাদাতের তামান্নায় পরিপুষ্ট এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার বিরুদ্ধে শুধু একটা কথাই বলা যেতে পারে যে, তিনি কঠিন সময়ে কিছু ভুল ব্যক্তির ওপর আস্থা রেখেছিলেন; যা তার ভুল ছিল। সর্বোপরি যার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সত্য এবং বাস্তব কথা হলো, মাওলানা আবদুল আজিজ না মৃত্যু দেখে ঘাবড়ে গেছে আর না পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে। বরং তিনি ওসিয়ত লিখে এবং গোসল করে শাহাদাতের জন্য প্রতীক্ষারত ছিলেন। এমতাবস্থায় অন্যান্য মানুষদের জীবন বাঁচানোর প্রত্যাশাই সব অনিষ্টের মূল হয়ে দেখা দিলো। তবে যাহোক, বাস্তবতা প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি এবং তিনি তা-ই করবেন।

আমি শুধু এতটুকু বলব যে, মাওলানা আবদুল আজিজ এবং তার জীবনবাজি রাখা সঙ্গীরা এই আন্দোলন কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে শুরু করেছিলেন। আল্লাহর দণ্ডবিধির মধ্যে পরিমার্জন, একের পর এক মসজিদের শাহাদাত, অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার অবাধ প্রসার, ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের মনগড়া ব্যাখ্যা, জিহাদের নাম উচ্চারণকারীদের ওপর আর্মি অ্যাটাক, মুসলিম মুজাহিদদের ধরে ধরে ভেড়া-বকরির মতো কুফফারদের হাতে তুলে দেওয়া এবং

সেকুলারিজমের বাধভাঙা প্রবাহ কখনো সহনীয় নয়। এ কারণে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল।

আমি এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করতে চাই যে, অভিযান চলাকালে জামিয়া হাফসার অভ্যন্তরে কোনো ছাত্রী বা ছাত্রকে জোরপূর্বক রেখে দেওয়া হয়নি। এখানে কেবলই সেসব লোক স্বেচ্ছায় অবস্থানরত রয়েছে, যাদের অন্তরের ভূমি মাওলানা আবদুল আজিজের আলোচনায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

আমি এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করে যেতে চাই যে, আমরা এই দেশে শরিয়াহর ন্যায়শাসন কামনা করি। আমরা আদালতে শরয়ি আইনকানুন বাস্তবায়িত হওয়ার প্রত্যাশী। আমরা চাই যে, মাজলুম জনসাধারণ ইনসাফ পাবে, রুটি পাবে। সকল প্রকার ষড়যন্ত্র, ঘুষ, অত্যাচার, অশ্লীলতা এবং স্বজনপ্রীতির অন্যায় ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটবে। শরিয়াহর প্রায়োগিক বাস্তবায়নই এসব সমস্যার একমাত্র কার্যকর সমাধান। এটা একে তো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, উপরন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও এটাই। আমরা দুনিয়ার সকল স্বার্থকে পেছনে ফেলে, কণ্টকাকীর্ণ পথের কাঠিন্য জেনে, সম্পূর্ণ চেতন মনে আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। আমার সঙ্গে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের অপরাধ কী? কিছু অপরাধীকে সংশোধনের নিয়তে উঠিয়ে আনার শাস্তি কি এই যে, এই অগণিত নিরপরাধ প্রাণকে বুলেটের লক্ষ্যবস্ত বানানো হবে? দেশের মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রবক্তারা আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান ও তার মান কেন পদে পদে ক্ষুণ্ণ করে আসছে?

যেসব লোক বিগত পাঁচ দিন যাবৎ কুরআনের হাফিজ এবং হাদিসের জ্ঞানার্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গুলি করে ঝাঁঝরা করেছে, নিঃসন্দেহে তারা জালিম। এ ক্ষেত্রে মিডিয়া চ্যানেলগুলোও অন্যায় পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছে। আমরা এ অভিযোগও আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোত্তম বদলাদাতা।

সর্বশেষে আমি ওসিয়ত হিসেবে দীনদরদী জনতা, আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসকল, ছাত্র-ছাত্রী তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ এবং মিডিয়ার সামনে আমার কথা পুনরাবৃত্তি করব যে, আমাদের আন্দোলন উত্তম ও কল্যাণমূলক কিছু লক্ষ্যকে

সামনে রেখে শুরু করা হয়েছিল। আমরা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আমরা এ ব্যাপারে আত্মপ্রশান্ত যে, আমরা দীনকে অগ্রাধিকার প্রদান, বিশ্বস্ততা রক্ষা এবং ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছি। আমরা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে সৌভাগ্য মনে করি। আমাদের আল্লাহর রহমতের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাদের রক্ত বিপ্লবের সুসংবাদ হবে। দুনিয়াবাসী কখনো আমাদেরকে এজেন্সিগুলোর দালাল বলেছে আবার কখনো বলেছে পাগল। আজ বারুদের বর্ষণ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াইরত রয়েছি। নিঃসন্দেহে হকপন্থীদের ওপর বিপদাপদ আসা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। যদি আমাদের আমির হজরত হুসাইন রা. অপারগতার অবস্থায় শহিদ হয়ে থাকেন তাহলে আমরাও সেই কাফেলারই যাত্রী। ইনশাআল্লাহ ইসলামি বিপ্লব এই দেশের চূড়ান্ত নিয়তি হবে।

চমন মেঁ আয়েগি ফসলে বাহারা,
হাম নেহিঁ হোঙ্গে।
বাগানে বসন্ত আসবে,
তবে আমরা তখন থাকব না।

শাইখ উসামা রহ. তার এক ভাষণে বলেছিলেন—

‘আমার মুসলমান পাকিস্তানি ভাইয়েরা, আমি আপনাদেরকে ডেকে ডেকে বলছি, আমি আপনাদেরকে আহ্বান করছি যে, আপনারা আল্লাহ এবং তার রাসুল ﷺ-কে সাহায্য করবেন এবং পারভেজের মতো নিজেদের ওপর আপতিত এক লজ্জা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবেন। আমার এই আহ্বান বিশেষ করে পাকিস্তানের আলিমদের প্রতি। আমি তাদেরকে সেই ফরজ বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা আল্লাহ তাদের ওপর অবধারিত করেছেন। সত্য প্রচার, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধের ফর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

“স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল—আপনারা মানুষের উদ্দেশে কিতাব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন এবং তা মোটেও গোপন করবেন না।” (সুরা আলে ইমরান : ১৮৭)

একইভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্যের বাণী বর্ণনা করা।” (মুসনাদু ইবনিল জা‘দ : ৩৩২৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১২; মুসনাদু আহমাদ : ১১১৪৩, ১৮৮২৮, ১৮৮৩০)

সুতরাং হে উলামায়ে কেরাম, আল্লাহকে ভয় করুন এবং নিজেদের দীনের সাহায্য করুন। ক্রুসেডার এবং তাদের সহযোগীদের বিপক্ষে জিহাদের ময়দানে স্বজাতির নেতৃত্ব দান করুন। আর আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।’

হৃদয়ে বাজে বেদনার সানাই

লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসার ব্যাপারে অনেক ধরনের আপত্তি ফেরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে সবচে বড় জটিলতা হলো, অধিকাংশ আপত্তিকারী তাদের আপত্তির ভিত্তি রাখে মিডিয়ার সংবাদের ওপর। অথচ এটা তো সর্বজনবিদিত বিষয় যে, প্রচলিত শক্তিশালী মিডিয়াগুলো আদ্যোপান্ত সেকুলার এবং সর্বদা পাপ ও পাপাচারে নিমজ্জিত। প্রায় সকল টিভি চ্যানেল এবং রেডিও স্টেশন সারাদিন খেলাধুলা ও অশ্লীলতার কালচার প্রচারে ব্যস্ত থাকে। এ ছাড়াও ক্ষমতার তল্পীবাহকদের সুদৃষ্টি পাওয়ার প্রত্যাশায় এবং তাগুতের অর্থে পকেট ভারী করার স্বপ্নে, সর্বোপরি নিজেদের জাগতিক উন্নয়নের জন্য এরা সর্বদাই প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিপক্ষেই কাজ করে থাকে। এদের নিউজে প্রকৃত ঘটনা ও তার যথার্থ বিশ্লেষণ উঠে আসবে—এমনটা ভাবাও তো দিবাস্বপ্ন বৈ কিছু নয়। কুরআন মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

‘হে ইমানদাররা, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা যাচাই করো। যাতে এমন না হয়ে যায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়কে আক্রান্ত করে বসবে এরপর নিজেদের কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হবে।’ (সুরা হুজুরাত : ৬)

লাল মসজিদের ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে আমরা ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। নিশ্চয়ই হকপন্থী ও হকসন্ধানীদের জন্য তাতে উত্তম শিক্ষা ও

দিকনির্দেশনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, লাল মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষগুলো আমাদের মতো 'নরমাল' মানুষ ছিল না; বরং তারা ছিল শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার চেতনায় রীতিমতো দেওয়ানা। আমাদের ওপর বিবেক ও যুক্তি প্রবল থাকে। তাদের ওপর ইশক প্রবল ছিল। এ জন্য হেকমত, আপিল, কৌশল, সরকারি সহযোগিতা, জনসাধারণের সমর্থন, অন্যান্য আলিমদের ঐকাত্মতা—এসব কোনো কিছুই তাদের কাছে মুখ্য ছিল না। যেভাবে খিলাফাহব্যবস্থাকে তার প্রাকৃতিক গতি থেকে বিচ্যুত হতে দেখে সায়্যিদুনা হুসাইন রা. সপরিবারে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতের সুধা পান করেছেন এবং নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার চিত্র এঁকে গেছেন, একইভাবে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে তার প্রতিষ্ঠার মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেখে লাল মসজিদওয়ালারাও নিজেদের জীবন কুরবানি করেছে। এভাবে তারা সত্যকে সমুন্নত করেছে, পরবর্তীদের জন্য উত্তম আদর্শ কায়েম করেছে এবং উম্মাহকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে গেছে। পৃথিবীবাসীর চোখে তারা মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তো অমরত্বের সুধা পান করেছে। 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বোলো না। বরং তারা জীবিত, নিজ প্রতিপালকের কাছে রিজিকপ্রাপ্ত।' সুতরাং শহিদরা কখনো মৃত নয়; মৃত তো তারা, আল্লাহ যাদের বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মোচিত করেননি। 'নিশ্চয়ই আপনি মৃতকে শোনাতে পারবেন না।'

প্রতিটা ক্ষেত্রে দু-ধরনের পথ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়—কখনো শয়তান ডেকে ডেকে বলে, তুমি আমার সঙ্গী হবে নাকি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে থাকবে? একই প্রশ্ন রহমানের পক্ষ থেকেও মুমিন বান্দার দিকে অভিমুখী হয়। এ জন্য বান্দাকে সর্বদা ভাবতে হয়—

বাতাও, তুম কিস কা সাথ দোগে;
ইধার হ্যায় শয়তান, উধার খোদা হ্যায়।

এ জন্য যারা হিদায়াতের ওপর থাকতে চায়, তাওহিদ ও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তাদেরকে প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলার আগেই ভাবতে হয়, এ পথটি কি রহমানের পথ নাকি শয়তানের পথ। এটা কি দাজ্জালের বাহিনী নাকি ইমাম মাহদি ও ইসা আ.-এর বাহিনী।

এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে, কিছু মানুষ হেকমতের অজুহাতে মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবের কর্মপন্থার সঙ্গে একমত না হয়ে ভিন্নমত পোষণ করবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, আমলি হেকমত আমাদেরকে কখনো শয়তানের সঙ্গে দাঁড়ানোর বা শয়তানের দলের সহযোগী হওয়ার অনুমতি প্রদান করে না। নিঃসন্দেহে মুমিনের জন্য এটা অনেক বড় পরীক্ষা।

লাল মসজিদ ট্রাজেডির ব্যাপারে সবচে বড় যে আপত্তিটি তোলা হয়েছে, তা হলো 'আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ভালো ছিল, তবে তাদের কর্মপন্থা গলদ ছিল। ইসলামি জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা যায় না।' দুঃখের বিষয় হলো, এ কথাগুলো শুধু যে অজ্ঞরা বলেছে, বিষয়টি তা নয়; বরং আমাদের গোত্রভুক্ত প্রবীণ কিছু মানুষও নিজেদের মুখে এ বাক্যই উচ্চারণ করেছে। কিন্তু কথা হলো, আন্দোলনকারীরা তো শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছিল। তাদের কর্মপন্থাও আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত তুলে ধরেছি। তারা তো কোনো উগ্রতা বা হিংস্রতার পথ বেছে নেয়নি। বরং শরিয়াহ নির্দেশিত পথেই তারা হেঁটেছে। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধের সুন্নাহকে জিন্দা করেছে। নববি পন্থায় কথা, কাজ এবং অন্তরের দ্বারা দাওয়াহ করেছে। তো এটা কীভাবে সম্ভব যে, কোনো একটা কাজ শরিয়াহ অনুমোদিত, বরং শরিয়াহ নির্দেশিত হবে; আবার সেটাকেই গলদ বলে আখ্যায়িত করা হবে! শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, এর ব্যতিক্রম কোনো পন্থা গ্রহণ করা কি সে সময় আদৌ সম্ভব ছিল? যদি এতদ্‌ভিন্ন কোনো পন্থা খোলাই থাকে তাহলে আপত্তিকারীরাই বা কেন সেটা গ্রহণ করে নিচ্ছে না? ধরে নিলাম, লাল মসজিদওয়ালাদের কার্যক্রম ভুল ছিল। তাহলে এ সকল ব্যক্তি সঠিক পন্থায় শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করে কেন দেখাচ্ছে না? আর সঠিক পন্থাটি আসলে কী? যদি বলা হয় গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ তবে সেই হারাম পন্থায় তো তারা চেষ্টা কম চালাননি। বিগত অর্ধ শতাব্দীর চাইতে বেশি সময় ধরে এই চেষ্টার ফলাফল কী হয়েছে? এর দ্বারা কি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাকি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব? 'মন্দের ভালো' ট্রেন্ডকে আজকাল ইসলামের মৌলিক বিষয়ের মধ্যেও ঢোকানো হয়েছে। এটাকে ব্যবহার করে কুফর ও শিরকের সঙ্গেও ইসলামকে মিশ্রিত করার কৌশল রপ্ত করানো হয়েছে। এ তো বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। বস্তুত হাদিসে বর্ণিত আল-ওয়াহানে আক্রান্ত হয়ে এবং নব্য ক্রুসেড যুদ্ধের পদধ্বনি শুনে ভীত হয়ে

তারা ইসলামকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছে। ইসলামের যতটুকু অংশ কুফফারগোষ্ঠীর অসন্তোষের কারণ নয়, তারা কেবল তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। প্রতিদিন আজানে ও নামাজে নিয়মিত 'আল্লাহু আকবর' তথা আল্লাহ সবচে বড় ঘোষণা করলেও তাদের মন ও মনন পৃথিবীর কুফরি পরাশক্তিকেই সবচে বড় মনে করে; এমনকি আল্লাহর ক্ষমতার ওপর তাদের আস্থা না থাকলেও কুফরি পরাশক্তির ক্ষমতার ওপর ঠিকই আস্থা রাখে। এমনকি তারা শাহাদাতকে পরম সৌভাগ্য মনে করার পরিবর্তে চরম হতভাগ্য মনে করে। শাইখ গাজি আবদুর রশিদ শহিদ রহ. তার শাহাদাতের মাত্র একদিন আগে দুঃখভরা কণ্ঠে বলেছেন—

'আলিমরা যদি মৃত্যুকে ভয়ই পাবে তাহলে কেন তারা দীনি পদসমূহ গ্রহণ করে?'

অসৎ কাজ হতে নিষেধ এবং আল্লাহর পথে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কোনো কার্যকর রূপরেখা আজ অবধি তারা উম্মাহর সামনে পেশ করেনি। তারা হেকমতের অজুহাতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধাচারণ করলেও, এমনকি শহিদদের মানহানি ও আহতদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেও লড়াইয়ের হেকমতপূর্ণ কোনো সুরতের সন্ধান তাদের থেকে আজও পাওয়া যায়নি। লাল মসজিদের ঘটনার এক যুগ পার হয়ে গেছে। তাদের থেকে এতকাল যাবৎ সমালোচনা শুনতে শুনতে কান ভারী হয়ে গেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও সমাধান কেউ দেয়নি বা দিতেও চায়নি।

দ্বিতীয় যে আপত্তিটি তোলা হয়েছে তা হলো, 'এক রাষ্ট্রের ভেতর আরেক রাজত্ব কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো।' সেকুলার দৃষ্টিকোণ থেকে এ আপত্তিটি যথার্থ মনে হলেও দীনি দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিটি নিতান্তই অসার। কারণ, মুমিনমাত্রই বিশ্বাস করে, সার্বিক রাজত্ব আল্লাহর। তিনিই সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই জমিন আল্লাহর। সুতরাং এখানে বিধানও চলবে একমাত্র তাঁর। যারা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, তারাই তো প্রকৃতপক্ষে অপরাধী। মুসলমানের বুকে এক ফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্তও তো সে চেষ্টা করবে, যেকোনো মূল্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনতে এবং অপরাধীদের হাত থেকে আল্লাহর জমিনকে দখলমুক্ত করতে। তা ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিতই হয়েছিল ইসলামের নামে। যারা সেখানে পূর্বের অঙ্গীকারের পরোয়া না করে জাহেলি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করেছে এবং পুরো জাতির সঙ্গে গাদ্দারি করেছে। সুতরাং যেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল

এবং তার বৃক্ষমূলে ছয় লাখ শহিদের রক্ত ঝরেছিল, সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা কীভাবে অপরাধ হতে পারে? তথাপি কথা হলো, রাষ্ট্রের মধ্যে আরও কত ধরনের মালিকানা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া হয়। ব্যক্তিক মালিকানা থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা—এ ধরনের আরও কত মালিকানা রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন সীমানার জায়গার ওপর বাস্তবায়িত রয়েছে। প্রত্যেকের মালিকানাধীন জমিতে তার মালিকের আইনকানুন চলে; যা রাষ্ট্রীয় আইনকানুন থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। এ নিয়ে কারও কখনো আপত্তি হয় না। সব আপত্তি হয় তখন, যখন রাষ্ট্রের কোনো অংশের ওপর আল্লাহ তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে কি এটা কুরআনের সেই আয়াতের বাস্তব রূপায়ন, যা নুহ আ. তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন—

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

'কী ব্যাপার! তোমরা কি আল্লাহর মহিমা মোটেও প্রত্যাশা করো না?' (সুরা নুহ : ১৩)

তৃতীয় মৌলিক আপত্তি হলো, 'এসব কিছুর দ্বারা পৃথিবীতে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা মানুষের সামনে আসছে।' এই আপত্তি যারা করে, তাদের জবাব দেওয়া আদতেই অর্থহীন। তবে একটা জিজ্ঞাসা তাদের সামনে রাখা যেতে পারে, কোন পৃথিবী নিয়ে আপনারা এত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন? এ কি সেই পৃথিবী, যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন কুরআনের অবমাননা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শানে গোস্তাখি করা হয়; যার পুরো অংশজুড়ে দীন ও শরিয়াহকে বর্জন করা হয়েছে; যেই পৃথিবী সর্বসম্মতিক্রমে লক্ষ-কোটি মুসলমানকে শহিদ করেছে, অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে, লাখো লাখো মায়ের বুক খালি করেছে, অজস্র সন্তানকে চিরতরে এতিম করেছে? এ কি সেই পৃথিবী, যে পৃথিবী মুসলিম উম্মাহকে আবু গারিব আর গুয়ান্তানামো'র মতো মহান সব জিন্দানখানা উপহার দিয়েছে? আরে, আপনারা কি এই পৃথিবী নিয়ে চিন্তিত? এই পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে আপনাদের ইমেজ নিয়ে উদ্বিগ্ন?

চতুর্থ আপত্তি যেটা করা হয় তা হলো, এই ছোট ছোট বাচ্চাদের কেন জিম্মি করে আন্দোলনে রাখা হলো। মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে মুসলিম জনসাধারণ, এমনকি উম্মাহর রাহবারদের মুখেও এ আপত্তি প্রায়শই উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, আন্দোলন চলেছে দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ। এই পুরো আন্দোলনের শক্তি ও প্রেরণা ছিল জিহাদি মানসিকতা। লাল মসজিদের ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে ছিল শাহাদাতের দুর্দমনীয় তামান্না। টেলিভিশন ইন্টারভিউয়ে বিভিন্ন সময়ে তারা এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে। আন্দোলনের শুরু থেকে লাল মসজিদের শাহাদাত অবধি বহুবার তারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে এ সত্য উচ্চারণ করেছে। তারা কোনো অবস্থায় পেছনে ফিরে যেতে চায়নি। কোনো অবস্থায়ই বাতিলের সঙ্গে আপস করার বা বাতিলের ভয়ে ভীত হয়ে ময়দান ত্যাগ করার মানসিকতা লালন করেনি। তাদের দু-চোখজুড়ে ছিল শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার আলোকিত স্বপ্ন। এই স্বপ্নই তাদেরকে তাড়িত করেছে সামনের দিকে। পুরো আন্দোলনের সার্বিক তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সব আলোকচিত্র জামিয়া প্রকাশিত খবরের কাগজ, সিডি এবং ক্যাসেটে সংরক্ষিত রয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের আলোকে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে যাদের জানাশোনা আছে, তাদের এটা অজানা নয় যে, আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই যেকোনো ছাত্রের জন্য স্বেচ্ছায় জামিয়া হাফসা ও লাল মসজিদ ত্যাগ করার প্রকাশ্য অনুমতি দিয়ে রাখা হয়েছিল। এমনকি যারা যেতে চেয়েছে, তারা কোনোপ্রকার বাধা ছাড়াই চলে গিয়েছে। সায়্যিদুনা হুসাইন রা.-এর মতো বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ঘোষণা ছিল, যে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন ছেড়ে যেতে চায়, সে যেন নির্দ্বিধায় চলে যায়। এরপরও যারা থেকে গিয়েছিল, তারা আমাদের মতো আল-ওয়াহানে আক্রান্ত কোনো সাধারণ মানুষ ছিল না; বরং তাদের প্রত্যেকেই ছিল শাহাদাতের ব্যাপারে বাইয়াতবদ্ধ। তারা সবুজ পাখির ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে জান্নাতে বিচরণ করার জন্য ছিল প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষারত। শহিদ আবদুর রশিদ গাজি রহ. টেলিভিশন ইন্টারভিউতে সময়ে সময়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

আমরা এটা কেন ভুলে যাই যে, ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার চেতনা কাল যদি সায়্যিদুনা আলি রা. (বয়স : ১৩ বছর), হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. (বয়স : ১৬ বছর) এবং হজরত জুবাইর রা. (বয়স : ১৮ বছর)-এর থাকতে পারে তাহলে আজ কেন ইসলামি আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করার চেতনা তাদের উত্তরসূরি এ সকল তরুণ-তরুণীর থাকতে পারবে না! এদের পূর্বসুরিরা যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ-এর জাদুময়ী প্রভাবে ব্রেইনওয়াশড হতে পেরেছিল এবং স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে দারুল আরকামে জিম্মি বানিয়েছিল, তো এরা নিশ্চয়ই তাদেরই

সন্তান-সন্ততি। সুতরাং আবু জাহলের প্রেতাত্মাদের কথায় এদের কী-ইবা আসে যায়! গ্রেফতারের পর তাগুতের কুকুররা অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখে ফেলেও এদের কারও মুখ থেকেই এ কথা বের করতে পারেনি যে, তাদেরকে লাল মসজিদের অভ্যন্তরে জিম্মি করে রাখা হয়েছিল। এমনকি বন্দি ছাত্রীরা পরবর্তীতে জানিয়েছে যে, তারা যদি মুখ থেকে একবার জিম্মি হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করত তাহলে সরকার তাদেরকে ৬০ রাজার রুপি প্রদানের অঙ্গীকার করেছিল। এতদ্সত্ত্বেও তারা পৃথিবীর তুচ্ছ স্বার্থের সামনে নিজেদের আদর্শ বিকিয়ে দেয়নি।

সর্বশেষ তাদের ব্যাপারে যে আপত্তিটি ফেরি করা হয় তা হলো, 'এরা তো মাদরাসার লোক। এদের দায়িত্ব ছিল মাদরাসা সামলানো। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ালেখা থেকে সরিয়ে আন্দোলনে লাগানোর অধিকার এদেরকে কে দিয়েছে?' আমার তো মনে হয়, এ আপত্তি অন্তত কোনো মুসলমানের মুখ থেকে বের হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত আসহাবুস সুফফা মাদরাসায়ও তো ছাত্ররা ছিল। কিন্তু এটাকে অজুহাত বানিয়ে তারা কি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে পিছিয়ে থাকত? মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুআল্লিম, কারি, ইমাম—এ-জাতীয় পদের মানুষ তো সাহাবিদের মধ্যেও ছিল। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর মতো মহান ফকিহ কুফাবাসীকে ফিকহ শিখিয়েছেন, একই মানুষ তো বদরের প্রান্তরে আবু জাহলের গলাও দ্বিখণ্ডিত করে উম্মাহকে দেখিয়ে দিয়েছেন—মাদরাসাওয়ালাদের কাজ শুধুই ইলমের প্রচার ও প্রসার নয়, তাদের কাজ শুধুই দাওয়াত খাওয়া আর ওয়াজ করে বেড়ানো নয়; বরং ইলমকে আমলে পরিণত করা, দীন ও ইলমের পথের সব প্রতিবন্ধককে নিজের হাতে দূর করাও তাদেরই কাজ। কারণ, যে জানে, তার দায় বেশি থাকবে—এটাই তো স্বাভাবিক। আজ যে আমরা মাদরাসার লোক আর সাধারণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করছি, এই পার্থক্য নিয়ে কি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারব? মাদরাসায় থাকি বলে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতকে তো আর বাদ দিই না। জিহাদের প্রসঙ্গ আসলে কেন অবস্থা উল্টে যায়? তখন কেন সব অজুহাত ও অপারগতা সামনে এসে দেখা দেয়? সাহাবিগণ জিহাদি আন্দোলন করেও লেখাপড়ায় খারাপ করেননি। আমরা তো সবকিছু বাদ দিয়েও তাদের পায়ের ধূলোর সমানও হতে পারছি না। কলেজ-ভার্সিটির যারা পড়ালেখার ক্ষতি হবে বলে নামাজ পড়ত না, আজ কি তারা

নিউটন হয়ে গেছে? আমরা যারা পড়ালেখার দোহাই দিয়ে ইসলামি আন্দোলন থেকে দূরে থাকি, আমরা কি সেই আবদুল্লাহ বিন মুবারকের মতো অন্তত হতে পেরেছি? তবে কি আমাদের জন্য এক শরিয়ত আর জনসাধারণের জন্য আরেক শরিয়ত। আমরা নিজেরা জিহাদ ছেড়ে দেবো, বিশ্বের কাছে নিজেদের ইমেজ সুন্দর করার জন্য সাধনা করব, আবার দিনশেষে আমরাই আপত্তি তুলব, জিহাদের ময়দানে সব জেনারেল মানুষ কেন? তাদের মধ্যে আলিমদের পরিমাণ এত কম কেন? এটা কি দীনের সঙ্গে এক ধরনের ধোঁকাবাজি নয়?

আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে, আমরা নিজেদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট। আমাদের ঘরানা, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ থাকলেই আমরা পরিতৃপ্ত। আল্লাহর দীন যদি লাঞ্ছিতও হতে থাকে, আমরা যেহেতু ভালো আছি, তাই সেদিকে আমাদের কোনো পরোয়া থাকে না।

শি'বে আবি তালিবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তিন বছরব্যাপী অবরুদ্ধ জীবন এবং হুসাইন রা.-এর কারবালা প্রান্তরের হৃদয়বিদারক ঘটনার যেসব দৃশ্য আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি, লাল মসজিদ ট্রাজেডিতে সেই অভিন্ন দৃশ্যই তো গ্রন্থের পাতা থেকে বাস্তবজগতে সকলের সামনে উঠে এসেছিল। সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম, দীনদার শ্রেণি, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো, মানবাধিকার, এমনকি প্রাণীঅধিকার সংরক্ষণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষগুলো নারী, শিশু এবং যুবকদেরকে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখেও সম্পূর্ণ অনুভূতিশূন্য ছিল। যারা পূর্ব থেকেই আন্দোলনের বিরোধিতা করে এসেছিল, তাদের অনেকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন এতে বেজায় খুশি। অপরাধীরা (!) বা অতি জযবাতিরা শাস্তি পেয়ে যাওয়ায় তাদের মন ভরে উঠেছে। চেয়ার বাঁচানোর তাগিদে সেকুলার চিফ জাস্টিসের নির্দেশে ইসলামের স্বঘোষিত ঠিকাদাররা গ্যালারির নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। গোলা এবং গুলির আঘাত নিরপরাধ মুসলমানদের ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেয়াল এবং কামরাগুলো একে একে ধ্বসে গেছে। চারিদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে। খাদ্যভাণ্ডার পুরোপুরি ফুরিয়ে গেছে। পুরো ইসলামাবাদ, পুরো পাকিস্তান, এমনকি পুরো মুসলিম বিশ্ব বসে বসে এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। কারও অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠেনি। এক উসমান রা.-কে বাঁচানোর জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ ১৪০০ সাহাবির থেকে

শাহাদাতের বাইয়াত নিয়েছে, শহিদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার আদায় করেছে, আল্লাহ তাআলাও কুরআনের আয়াত নাজিল করে নিজে সেই বাইয়াতে শরিক থাকার ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ শত শত উসমানের শাহাদাত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও নবি ﷺ-এর কথিত উত্তরসূরিরা নীরব। উল্টো বরং সমালোচনায় সরব। আল্লাহ বলেন—

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

‘তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করছ না, যারা দুয়া করছে—“হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও। এখানকার অধিবাসীরা জালিম। আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও।’ (সুরা নিসা : ৭৫)

উল্টো বরং দীনদার জ্ঞানী মহলের থেকে বারবার এই প্রশ্ন ছোড়া হয়েছে, ‘তাদের কাছে অস্ত্র দেখা যাচ্ছে কেন?’ যেন তাদের প্রত্যাশা ছিল, কুকুর-বেড়ালের মতো সবাইকে হত্যা করা হোক। কোনোপ্রকার বাধা ছাড়াই পাকিস্তানের নাপাক আর্মিরা তাদের মিশনে সফল হয়ে যাক। লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিণতিও গুয়ান্তামোর বন্দিদের মতো হোক। হাত ও দু-চোখ বেঁধে, বিবস্ত্র করে সবাইকে অমানবিক পন্থায় নির্যাতন করা হোক। যুবকদেরকে হিংস্র কুকুরের খাবারে পরিণত করা হোক। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই স্বঘোষিত উত্তরসূরিরা দাওয়াত খাওয়ার সুন্নত স্মরণে রাখলেও তাগুতকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করার সুন্নতকে ভুলে গিয়েছে বা ইচ্ছাকৃত ভোলার ভান করেছে। অস্ত্র রাখাই যদি আন্দোলনকারীদের অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে এ সকল জ্ঞানপাপী আল্লাহর রাসুল ﷺ এবং তার সাহাবিদের ব্যাপারে কী বলবে? কোন সাহাবি

এমন ছিলেন, যিনি অস্ত্র রাখাকে অপরাধ মনে করতেন এবং ভালো নাগরিক হওয়ার ইচ্ছায় অস্ত্রকে সযত্নে বর্জন করে চলতেন? আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً... وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

‘কাফিররা কামনা করে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং আসবাবপত্র সম্পর্কে উদাসীন হও, যাতে তারা অতর্কিতে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ...তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার সামগ্রী আঁকড়ে রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।’ (সুরা নিসা : ১০২)

নিশ্চয়ই যারা সেদিন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও লাল মসজিদে অবরুদ্ধ ভাই-বোনদের সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছিল, তারা সাধারণ অপরাধী নয়; বরং তারা মহা অপরাধী। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَا مِنَ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ

‘যখন কোনো মুসলমানের সম্ভ্রমহানি হয় এবং তার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয় তখন যে ব্যক্তি তাকে অসহযোগিতা করে, আল্লাহ তাকে এমন জায়গায় অসহযোগিতা করবেন, যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে।’ (মুসনাদে আহমাদ : ৪৮৮৪)